সোমবার, ৯ জুলাই ১৪২৫
বর্ষ : ১৩, সংখ্যা : ১৯২

জম্মু-কাশ্মীরে শান্তি চাই

রাজনৈতিক চাপানউতোর সঙ্গে সঙ্গে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল জম্মু ও কাশ্মীর। জম্মু-কাশ্মীরের সোপিয়ানে জঙ্গিরা এক পুলিশ কনস্টেবলকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সূত্রের খবর, পুলিশ কনস্টেবলের নাম জাভেদ আহম্মদ দার। তিনি যখন একটি ওষুধের দোকানে ওষুধ কিনছিলেন, সেই সময় জঙ্গিরা তাঁকে অপহরণ করে। উল্লেখ্য, মাসখানেক আগেই জঙ্গিরা পুলওয়ামায় গত ১৪ জুন ভারতীয় সেনা ঔরঙ্গজেবকে অপহরণ করে হত্যা করে। ঔরঙ্গজেব সোপিয়ানের দিকেই যাচ্ছিলেন একটি বেসরকারি বাসে চেপে। তাঁর গাড়ি আটক করে জঙ্গিরা তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায় এবং পরে তাঁকে খুন করে।

এই ঘটনার পরেই সোপিয়ান ও সংলগ্ন এলাকায় সেনাবাহিনী ব্যাপক তল্লাশি চালায়। জম্মু পুলিশের একটি দল ও ভারতীয় সেনাবাহিনী পুলওয়ামা জেলায় কালামপোড়া থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে ঔরঙ্গজেবের গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ উদ্ধার করে। গোয়েন্দা বাহিনী একটি টিভি চ্যানেলকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিল, লস্কর-ই-তৈবার চার জঙ্গি ও হিজবুল মুজাহিদিনের দুই জঙ্গি এই অপহরণের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি করে এবং তারাই ঠান্ডা মাথায় জওয়ান ঔরঙ্গজেবকে গুলি করে মেরেছিল। জঙ্গিরা এই সেনাবাহিনীর জওয়ানকে অপহরণ করার সময় অল্টোকার ব্যবহার করেছিল। এর পেছনে পাক গোয়েন্দা বিভাগ আইএসআই-এর হাত আছে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনী। ঔরঙ্গজেবকে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পুঞ্চে সমাহিত করা হয়।

এদিকে কাশ্মীরে নিহত বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা বুরহান ওয়ানির মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে উপত্যকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢেলে সাজানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আগামিকাল রবিবার রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে নিরাপত্তা বাহিনী দুই বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা ইয়াসিন মালিক ও মীরওয়েজ উমর ফারুখকে গৃহবন্দি করেছে। মীরওয়েজ উমর ফারুখকে তাঁর নাইজিংয়ের বাসভবনে গৃহবন্দি রাখা হয়েছে। জেকেএলএফ নেতা ইয়াসিন মালিককে পুলিশ আটক করে থানায় পাঠিয়েছে।

উল্লেখ্য, ২০১৬ সালের ৮ জুলাই নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বুরহান ওয়ানির মৃত্যু হয়। এরপর কাশ্মীর জুড়ে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে ৯০ জন সাধারণ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল এবং আহতের সংখ্যা চার হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর ছর্‌রা গুলিতে ১০০ জন দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।

অমৃত কথা

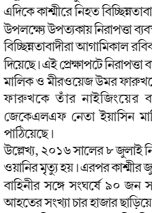

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ

"আবার পুরুষ মেয়ের অন্য অন্য লক্ষণ আছে। খারাপ লক্ষণ—টেরা, চোখ কোট্‌র, উন পাঁজর, বিড়াল চোখ, বাছুরে গাল।"

(সমাধি-তত্ত্ব ও গিরিশ—ঈশ্বর লাভের উপায়—গিরিশের প্রশ্ন)

গিরিশ—আমাদের উপায় কি?
শ্রীরামকৃষ্ণ—**ভক্তিই সার।** আবার ভক্তির সত্ত্ব, ভক্তির রজঃ, ভক্তির তমঃ, আছে। "ভক্তির সত্ত্ব দীনহীন ভাব; ভক্তির তমঃ যেন ডাকাত-পড়া ভাব। আমি তাঁর নাম করছি, আমার আবার পাপ কি? তুমি আমার আপনার মা, দেখা দিতেই হবে।" গিরিশ (সহাস্যে) — ভক্তির তমঃ আপনিই তো শেখান।—শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে) — তাঁকে দর্শন করবার কিন্তু লক্ষণ আছে। সমাধি হয়। সমাধি পাঁচ রকমের ; ১ম ঃ- পিঁপড়ের গতি, মহাবায়ু উঠে পিঁপড়ের মত। ২য় ঃ- মীনের গতি। ৩য় ঃ- তীর্যক গতি। ৪র্থ ঃ- পাখির গতি, পাখি যেমন এ ডাল থেকে ও ডালে যায়। ৫ম ঃ- কপিবৎ, বানরের গতি ; মহাবায়ু যেমন লাফ দিয়ে মাথায় উঠে গেল আর সমাধি হল। "আবার দু রকম আছে; ১ম— স্থিত সমাধি; একেবারে বাহ্যশূন্য; অনেকক্ষণ হয়ত অনেকদিন, রহিল। ২য় ঃ—উন্মনা সমাধি; হঠাৎ মনটা চারিদিক থেকে কুড়িয়ে এনে ঈশ্বরেতে যোগ করে দেওয়া।"

দিনপঞ্জিকা

২৪ আষাঢ়, ভাঃ ১৮ আষাঢ়, **৯ জুলাই,** ২৪ আহার, সংবৎ ১১ আষাঢ় বদি, ২৪ শওয়াল। সূর্য্যোদয় ঘ ৫।২, সূর্য্যাস্ত ঘ ৬।২৩। **সোমবার,** একাদশী অপরাহ্ণ ঘ ৫।২৫ মিঃ। কৃত্তিকানক্ষত্র রাত্রি ঘ ২।৩৭ মিঃ। শূলযোগ রাত্রি ঘ ৯।৪০ মিঃ। ববকরণ, দিবা ঘ ৬।৬ গতে বালবকরণ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।২৫ গতে কৌলবকরণ, শেষরাত্রি ঘ ৪।৩৩ গতে তৈতিলকরণ।। **জন্মে**— মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ঘ ৯।১১ গতে বৃষরাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ, রাত্রি ঘ ২।৩৭ গতে নরগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। **মৃতে**— দ্বিপাদদোষ, অপরাহ্ণ ঘ ৫।২৫ গতে ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ঘ ২।৩৭ গতে একপাদদোষ। **যোগিনী**— অগ্নিকোণে, অপরাহ্ণ ঘ ৫।২৫ গতে নৈর্ঋতে। **কালবেলাদি** ঘ ৬।৪২ গতে ৮।২২ মধ্যে ও ৩।৩ গতে ৪।৪৩ মধ্যে। **কালরাত্রি** ঘ ১০।২৩ গতে ১১।৪৩ মধ্যে। **যাত্রা**— নাই, রাত্রি ঘ ২।৩৭ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে ও পশ্চিমে নিষেধ। **শুভকর্ম্ম**— বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন গোবিক্রয়াদি। **বিবিধ**— একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। **একাদশীর উপবাস (যোগিনী)।** সায়ংসন্ধ্যা নিষেধ। **গোস্বামীমতে ও নিম্বার্কসম্প্রদায়মতে অদ্য একাদশীর উপবাস।** **অমৃতযোগ**— দিবা ঘ ৮।৩৫ গতে ১০।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ঘ ৯।১৩ গতে ১২।৩ মধ্যে ও ১।২৮ গতে ২।৫৪ মধ্যে। **মাহেন্দ্রযোগ**— রাত্রি ঘ ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

মুসলিম পঞ্জিকা

২৪ আষাঢ়, ভাঃ ১৮ আষাঢ়, **৯ জুলাই,** ২৪ শওয়াল, ২৪ আহাব, উঃ ৫/০০, অঃ ৬/২২, সোমবার, একাদশী অপঃ ঘ ৫/২৪, সেহ্‌রী শেষ ৩/২৬, ইফ্‌তার ৬/৩০।

মাদককে 'না' বলুন।
যে নেশা করতে বলে, সে বন্ধু নয়
লিপি
মাদক বিরোধী আন্দোলন

শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবান্দোলনে মাতৃধাম জয়রামবাটী

দুর্গাপদ চট্টোপাধ্যায়
পর্ব - ৩

শ্রীমাকে সর্ববিষয়ে সাহায্য করে শ্রীম নিজেকে ধন্য মনে করতেন। ১৯১৫ খ্রিষ্টাব্দে একবার জয়রামবাটীতে থাকাকালীন তাঁর ইচ্ছে হল শ্রীমায়ের চরণদুটি পূজা করবেন ফুল-চন্দন দিয়ে। মুখেচারা তিনি কাকে বলবেন ফুল-চন্দনের জন্য! শ্রীমা সন্তানের মনের কথা টের পেয়ে একটি ছোট মেয়ের হাত দিয়ে ফুলচন্দন পাঠিয়ে বললেন, "ছেলে যদি এগুলি দিতে চায়, এখানে এসে দিতে পারে।" শ্রীমায়ের এই অহৈতুকী কৃপায় মাষ্টারমহাশয়ের মনস্কামনা পূরণ হয়।[৯] শ্রীমাকে আর্থিক সাহায্যদান শ্রীম-এর জীবনের অন্যতম ঘটনা।

ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দে যখন পুত্রশোকে বিহ্বল, তখন সেই অমোঘ ঔষধের সন্ধান পেয়ে নিরঞ্জন মহারাজ্যের সঙ্গে জয়রামবাটীতে ছুটে আসেন। গিরিশচন্দ্র জয়রামবাটীতে পৌঁছানো মাত্র স্নান করে ভিজা কাপড়ে প্রণাম করতে আসেন শ্রীমায়ের কাছে। শ্রীমা তাঁকে আশীর্ব্বাদ করেন। গিরিশচন্দ্র শ্রীমায়ের যত্নে অভিভূত। তিনি মহানন্দে জয়রামবাটীর চাষা-ভূষাদের সঙ্গে খোশমেজাজে গল্প করতেন, রঙ্গরস করতেন। প্রায় ছ'মাস রয়ে গেলেন গিরিশচন্দ্র। শ্রীমায়ের নিজের উক্তি থেকে জানা যায়, গিরিশচন্দ্র এক সময়ে দেড় বছরকাল শ্রীমায়ের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন। শ্রীমায়ের নিকট সস্ত্রীক দীক্ষিত ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায় (কাইজার) জয়রামবাটীতে প্রায়ই আসতেন। শ্রীমায়ের জন্মস্থান ক্রয় ও গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর কার্যকরী ভূমিকা ছিল। তিনি শ্রীমাকে শোনানোর জন্য

জয়রামবাটীতে প্রথম গ্রামাফোন নিয়ে এসেছিলেন। ১৩২২ বঙ্গাব্দে জয়রামবাটীতে 'শ্রীশ্রীসারদা দাতব্য ঔষধালয়' স্থাপন করে ললিতমোহন আমৃত্যু ব্যয়ভার গ্রহণ করেছিলেন এবং শ্রীমাকে মাসিক দশ টাকা করে হাত খরচ দিতেন।[১০] রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অকৃত্রিম বন্ধু ললিতমোহন শ্রীমায়ের সেবা করে জীবনসার্থক করেছিলেন।

স্বামী সারদানন্দ ওরফে শরৎ মহারাজের সর্বপ্রথম জয়রামবাটীতে পদার্পণ ১৮৯১ খ্রিষ্টাব্দেই। শ্রীমায়ের পিতৃগৃহে জগদ্ধাত্রীপূজা (১০ নভেম্বর) হবে জেনে কলকাতা থেকে তিনি তিন-চারদিন আগে পূজার উপকরণাদি নিয়ে জয়রামবাটী আসেন এবং তাঁর সঙ্গে ছিলেন সান্যাল মহাশয়, হরমোহন মিত্র, কালীকৃষ্ণ ওরফে স্বামী বিরজানন্দ, গোলাপ মা ও যোগীনমা। তাঁরা বর্ধমান থেকে গরুর গাড়িতে কামারপুকুরে আসেন এবং ঠাকুরের জন্মস্থান ও বাল্যলীলাদি স্থান দর্শন করে পদব্রজে জয়রামবাটী পৌঁছান। তাঁদের পেয়ে শ্রীমায়ের আনন্দ আর ধরে না—কিভাবে তাঁদের যত্ন করবেন, কি খাওয়াবেন ভেবে পান না। প্রতিদিনই তিনি স্বহস্তে রান্না করে সযত্নে খাওয়াতেন। সারদানন্দ ছিলেন শ্রীমায়ের দীর্ঘকালের ও শেষ সেবক। শ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে থাকতেন, তখন তাঁর মন জয়রামবাটীতেই পড়ে থাকত। তিনি শ্রীমায়ের জীবদ্দশায় এবং শরীর যাবার পরে শ্রীমায়ের জন্মস্থানের ব্যবস্থা, মাতৃমন্দির প্রতিষ্ঠা, আশ্রম স্থাপন, দীক্ষা-সন্ন্যাস-ব্রহ্মচর্য দেওয়া এবং জয়রামবাটীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য দীর্ঘকাল বাসও করেছিলেন।[১১]

স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ একবার শ্রীমাকে জয়রামবাটীতে পৌঁছাতে গেছেন। স্বামী বিরজানন্দও ছিলেন। বর্ধমান থেকে গরুর গাড়িতে উঠলেন তাঁরা, আর শ্রীমা পালকিতে। এভাবে তাঁরা এসেছিলেন জয়রামবাটীতে। আরেকবার বর্ধমান থেকে শ্রীমাকে গরুরগাড়িতে আনছেন, গাড়ির সামনে লাঠি মাথায় হেঁটে হেঁটে আসছেন ত্রিগুণাতীত। ১৮৯১ সালের অক্টোবর, গভীর রাত্রি। গাড়ির কাঁচ্‌ কাঁচ্‌ শব্দ ছাড়া আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। হঠাৎ দেখেন রাস্তা একেবারে ভাঙ্গা। ত্রিগুণাতীত সটান শুয়ে পড়লেন ভাঙ্গারাস্তার উপর। গাড়োয়ানকে আদেশ করলেন তার উপর দিয়ে গাড়ি চালাতে। কিন্তু অন্তর্যামিনী শ্রীমায়ের ঠিক ঐখানেটায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। পরিস্থিতি বুঝেই শ্রীমা গাড়ি থেকে নেমে পড়লেন এবং হেঁটে পার হলেন।[১২] স্বামী সারদেশানন্দ, স্বামী সৎসঙ্গনন্দ, স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ, স্বামী কেশবানন্দ, স্বামী পরমেশ্বরানন্দ, স্বামী বিদ্যানন্দ, স্বামী ধ্রুবানন্দ, স্বামী দীশানানন্দ, ব্রহ্মচারী রূপচৈতন্য প্রমুখ অনেকেই জয়রামবাটীতে শ্রীমায়ের সান্নিধ্যে ছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সঙ্ঘের ত্যাগী সদস্যরূপে অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দ ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে জয়রামবাটীতে এসে ছিলেন কিনা সে সম্পর্কে মতভেদ আছে। স্বামী গম্ভীরানন্দের মতে, নরেন্দ্রনাথ ১৮৮৯ খ্রিষ্টাব্দে কামারপুকুরে গিয়েছিলেন (যুগনায়ক বিবেকানন্দ, ১ম ভাগ, ২য় সং পৃঃ ২৩১)। **ক্রমশ**

গুরুপূর্ণিমা উদ্‌যাপনের ইতিবৃত্ত

কাঞ্চন বসু

গুরুরা যদিও প্রাচীন হিন্দুধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তবুও তাঁদের সম্মানে আষাঢ় মাসে একটি পূর্ণিমা উদ্‌যাপন করার ব্যাপারটা বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের অবদান। ছাত্রদের শৈশব ও কৈশোর (মানে ব্রহ্মচর্যের গোটা পর্যায়টা) জুড়েই গুরুদের আশ্রম বা পাঠশালাগুলি আবাসিক বা অনাবাসিক পড়াশোনার জায়গা হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু বছরের ঠিক কখন পড়াশোনাটা শুরু হত, সেটা নিয়ে কেউই একমত নন। যে গুরুরা নির্দিষ্ট কোনও কৌশল শেখাতে, ধরা যাক অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্য, তাঁরা তাঁদের শিক্ষাবর্ষ কোনও নির্দিষ্ট সময়ে শুরু করতেন না, আর আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা ধর্মীয় শিক্ষাগুরুরা এসব ব্যাপারে বেশ ঢিলেঢালা ছিলেন (এখনও আছেন)। বৌদ্ধরা কিন্তু এই ব্যাপারে পরিষ্কার ঃ গুরুপূর্ণিমা হবে বর্ষার (পালি ভাষায় 'বসসা') একেবারে গোড়ায়, যখন নবীন-প্রবীণ সমস্ত শ্রমণকে জনপদ ছেড়ে পাহাড়ের গুহায় বা মঠে গিয়ে জড়ো হতে হবে এবং তাঁদের সে বছরের শিক্ষাগুরু হবে। সন্ন্যাসী নয় এমন মানুষও উৎসাহী হলে কিছু বিষয়ে পাঠ নিতে পারতেন, যেমন— শাস্ত্র, ধর্মতত্ত্ব, ভেষজ চিকিৎসা।

বর্ষাবাস নামে পরিচিত এই পূর্ণিমার দিনটিতে সারা ভারতে বর্ষা শুরু হত, যদিও উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলো অন্য অঞ্চলের আগেই বৃষ্টি পেয়ে যেত। এই দিনটিতে শিক্ষক এবং ছাত্ররা একত্রিত হয়ে, শুরু করতেন তেরো সপ্তাহের অর্থাৎ 'তিন মাসকাল শিক্ষা' (Trimaster course)। ওই একই সময়ে জৈনধর্মেও 'চতুর্মাস', বা চার মাসের ধর্মনিষ্ঠার পর্ব শুরু হত। এখনও বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মে এই ঐতিহ্য বেশ কড়াভাবেই পালন করা হয়।

জৈনরা বিশ্বাস করেন যে, এই দিনেই গান্ধারের গৌতম স্বামীকে, মহাবীর তাঁর প্রধান শিষ্য হিসেবে গ্রহণ করেন ও দীক্ষা দেন। বুদ্ধও তাঁর বোধিজ্ঞান লাভের এক মাস পর, এই আষাঢ়ের পূর্ণিমাতেই, সারনাথে গিয়ে তাঁর পাঁচ প্রাক্তন সঙ্গীকে প্রথম উপদেশ দিয়েছিলেন, যাহা 'ধম্ম-চক্ক পবত্তন সুত্ত' নামে পরিচিত। তারপরেই তিনি বর্ষার চার মাস কাটিয়েছিলেন মূলগন্ধ-কুটিতে। এই সময়টাই বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের অনুসারীদের আত্মসংযমের সময়, যখন মাংস বা মাছ বা অন্যান্য কিছু খাবার থেকে নিজেদের বিরত রাখতে হয়।

সিংহলিরা এখনও এই বর্ষাবাস পালন করেন, তাঁদের ক্যালেণ্ডারে যখন বর্ষা আসে সেই অনুযায়ী, আর তাইল্যাণ্ডের বৌদ্ধরা একে বলেন 'ফানসা' এবং জুলাই থেকে অক্টোবর অবধি এটি বেশ অনুগতভাবেই পালন করেন। ভিয়েতনাম, তিব্বত ও

কোরিয়ার বেশ কিছু বৌদ্ধ গোষ্ঠী এই সময়টিতে এক জায়গা ত্যাগ করে অন্যত্র যান না। মায়ানমারেও অনেকেই 'বসসা' পালন করেন।

'বসসা' প্রকৃতপক্ষে থেরবাদী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের অবশ্য পালনীয় একটি 'শীল' বা 'নিয়ম', বাংলা ভাষায় যা 'বর্ষাবাস' নামে খ্যাত। আষাঢ়ী পূর্ণিমা থেকে আশ্বিনী পূর্ণিমা (বৌদ্ধ সাহিত্যে প্রবারণা পূর্ণিমা, বাংলায় কোজাগরী পূর্ণিমা)— এই চার মাস বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটি নির্দিষ্ট বিহারে অবস্থান করতে হয়। এই সময়কালের মধ্যে গুরুর অনুমতি ছাড়া অন্য কোনও বিহারে রাত্রিবাস করলে তা শীলভঙ্গের পর্যায়ে পড়ে।

গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুদের নিয়মানুবর্তিতা এবং চারিত্রিক পরিশুদ্ধির জন্য ২২৭টি নিয়ম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। যাকে পালি ভাষায় 'পাতিমোক্‌খ' বলে। নিয়মগুলি বুদ্ধদেব বিভিন্ন সময়ে নানারকম সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলির পরিপ্রেক্ষিতে ভিক্ষুসংঘের জন্য নির্ধারণ করেন। পরে এই নিয়মাবলির কিছু কিছু অংশ পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন করেছিলেন তিনি।

বর্ষাবাসও অনুরূপ একটি নিয়ম, যা প্রথম দিকে ভিক্ষুসংঘের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু পরবর্তী কালে কোনও একটি বিশেষ পরিস্থিতি উদ্ভব হওয়ায় গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুসংঘের মধ্যে এই নিয়মটির প্রবর্তন করেছিলেন।

ভিক্ষাম্ন গ্রহণের মাধ্যমেই বৌদ্ধ ভিক্ষুরা আহার্য সংগ্রহ করতেন। বর্ষার সময়ে তাঁদের ভিক্ষান্ন সংগ্রহের জন্য মাঠঘাট, আলপথ, কখনও বা কৃষিজমি পেরিয়ে বৌদ্ধ বিহার থেকে পাশ্ববর্তী গ্রামে যেতে হত। সেই সময় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পদভারে দলিত হত গ্রামের কৃষকদের সদ্য বপন করা চারাগাছ, শস্যক্ষেত্র ইত্যাদি। এর ফলে গ্রামবাসীরা প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হতেন। ক্রমে তাঁদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে লাগল। একবার একটি গ্রামের গ্রামবাসীরা একত্রিত হয়ে বুদ্ধের কাছে এই সব সমস্যার কথা জানিয়ে অনুযোগ করলে বুদ্ধ বিচার বিবেচনা করে তাঁর ভিক্ষুসংঘে এই বর্ষাবাস নিয়ম পালনের জন্য কঠোর নির্দেশ দেন। এই চার মাস বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রমণরা পণ্ডিত ভিক্ষুদের কাছ থেকে বিভিন্ন পাঠ গ্রহণ করতেন এবং ধ্যান সমাধি অনুশীলনে নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন, যা আজও বিভিন্ন দেশের থেরবাদী ভিক্ষুসংঘে চিরাচরিত রীতিতে পালিত হয়ে আসছে। বিনয় পিটকের দ্বিতীয় বিভাগ 'খন্ধক'-এর 'বস্‌সূপনায়িকা খণ্ডক'-এ (বর্ষোপনায়ক স্কন্ধ) ভিক্ষুদের বর্ষাবাসের বিধান, বর্ষাবাসের সময়, যোগ্যস্থান, অযোগ্য স্থান ইত্যাদি বিষয়ে নিয়মাবলি প্রবর্তনের বিবরণ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মের ভালো নিয়মগুলি আত্তীকরণ করতে হিন্দুধর্মেই খুব দেরি হয়নি। এই দুই ধর্মেই বুদ্ধিজীবীরা কিছুদিন অন্তর একত্রিত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে, মহাসম্মেলনে বা মঠে ধর্মের বিভিন্ন অংশ নিয়ে আলোচনা ও তর্ক করতেন। মনে রাখা প্রয়োজন যে, হিন্দুধর্ম তার সংগঠিত রূপ ও সুস্পষ্ট চেহারা পায় আরও হাজার বছরেরও পর, যখন শংকরাচার্য এবং অন্যান্য মহান আচার্যেরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। যদিও ঋগ্বেদ বা বিভিন্ন উপনিষদে গুরু সম্পর্কে খুবই সশ্রদ্ধ উক্তি আছে, কিন্তু গুরুকে পূজা করার জন্য একটি নির্দিষ্ট তারিখ আলাদা করে রাখার কোনও উদ্যোগ সেখানে খুঁজে পাওয়া যায় না। অনেক পরে এসেছে ব্যাসমুনির ঘটনা বা ২১৬ শ্লোকে গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য 'গুরুগীতা'। আদি শংকরাচার্যের উপদেশগুলিও, ইতিহাসবিদদের মতে, বুদ্ধ-মহাবীরের অন্তত দেড় সহস্রাব্দ পর রচিত। গুরুপূর্ণিমার গুণকীর্তন করা অন্যান্য রচনা, যেমন— বরাহ পুরাণ, এসেছে আরও পরে, যদিও এটা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায় যে, এই উৎসবটি সার্বজনীন ভাবে গৃহীত হয়ে গিয়েছিল খ্রিষ্টধর্মের প্রচলনের আগেই।

অপর একটি দিক হল, বর্ষাকালে মাঠ-ঘাট ও জঙ্গল থাকত জলে পূর্ণ, সাপে আর পোকামাকড়ে ভর্তি। এটি বহুপ্রাণীর যৌন মিলনের ঋতু ও বটে। সমাজের অনুৎপাদক শ্রেণিকে এই সময়টায় মাঠ-ঘাট থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে, তাঁদেরও লাভ, প্রাণীদেরও সুবিধা। সত্যি বলতে কী, এই যে প্রত্যেক বছরের জ্ঞান ও কৃৎকৌশলের পাঠ্যক্রমটা এই সময়েই শুরু হত, এতে সবচেয়ে লাভ হয় হিন্দু ধর্মেরই। কারণ এই ধর্মে মধ্যযুগের শেষ সময়টা অবধি কোনও কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের আওতায় সংগঠিত শিক্ষাকেন্দ্র বা মঠ ছিলনা।

শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্তিক— এই চারটি মাসের পাঠ্যক্রম কখনও তিন মাসেও ছেঁটে আনা হত, বর্ষার মেয়াদ এবং ওই অঞ্চলের প্রয়োজন অনুযায়ী। আরও জরুরি ব্যাপার হল, গুরুদের তো টিকে থাকার জন্য আর্থিক অবলম্বন দরকার হত। এই সময়ে তাঁরা যে দান ও অর্ঘ্য পেতেন, তা খুবই কাজে লাগত। ভক্তি আন্দোলন— যা তুঙ্গে উঠেছিল চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যে— হিন্দুধর্মকে জনগণের কাছে খুব প্রিয় করে তোলে এবং তার নেতৃত্ব দেন সব সম্প্রদায়ের গুরুরা। এর ফলে 'গুরুপূর্ণিমা' উৎসবটির প্রচলন আরও বেড়ে যায়।

গুরুকুল ব্যবস্থার একটা বিরাট অবদান হল, এর মাধ্যমে সঙ্গীত ও নৃত্যের এমন নিবিড় প্রশিক্ষণ ও উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল, যা অন্য কোনও শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনও দিন ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। সোজা কথায়, এই ক্ষেত্রে কোনও একলব্যকে কোনও দিন ফিরিয়ে দেওয়া হত না। হাজার বছর ধরে, ভারতের সুফি সিলসিলাগুলি এই ধরনেরই সংগঠন চালিয়েছে, তবে এর চেয়েও বেশি সুসংবদ্ধভাবে। সেগুলির নাম খানকুয়াহ্‌, যেখানে মুরশিদ বা শেখ-রা প্রজন্মের পর প্রজন্ম মুরিদদের সংস্কৃতি ও ধর্মতত্ত্ব শিখিয়েছেন। কেন যে ভারতীয় উপমহাদেশেই সবচেয়ে বেশি 'মুসলিম' থাকেন, তা বোঝা যায় এগুলি খেয়াল রাখলে। এখন 'উস্তাদ' কথাটা সংগীতের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ হিন্দু 'গুরু'রই মুসলিম সদৃশ-শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং এই গুরু-শিষ্য পরম্পরা না থাকলে, বিংশ শতাব্দীতে যখন নবাব বা রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা উবে গেল, আর সংস্কৃতির গণতন্ত্রায়ন ঘটে গেল, তখন নাচ ও গানের অসামান্য চর্চা নিজেদের টিকিয়ে রাখতেই পারত না।

গুরুদের ব্যাপারে আর একটা জিনিস লক্ষ্য করার, ভারতীয় পুরাণ একেবারে ভর্তি সেই ধরনের গল্পে, যেখানে মুনি-ঋষিদের গুরুকুল আশ্রম বা তপোবনে বারবার রাক্ষস আর অসুরেরা আক্রমণ চালাত। এর ফলেও আর্যপুত্ররা তাদের হত্যা করতেন, আর নিজেদের 'সভ্যতা'কে আরও প্রসারিত করতেন। এই অজুহাতে, আঞ্চলিক মানুষের ওপর বেশ চমৎকার সুপরিকল্পিতভাবে আধিপত্য বিস্তার করা যেত এবং তথাকথিত 'আর্যত্ব'কে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যেত। গুরু ও ঋষিরা যদি অজানা অঞ্চলে ঢুকে না পরতেন, তা হলে ওইভাবে বনভিত্তিক সংস্কৃতিকে উপড়ে, 'সংস্কৃত' ধরনের জীবনযাপন শতাব্দী এবং সহস্রাব্দ জুড়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারত না।

সম্পাদক সমীপেষু

কী দেবে কতখানি দেবে

কী দিতে পারা যায়, কতখানি দিতে পারা যায়, এই হিসাবটা কেউ কোনো দিন হিসাব করে দিতে পারবে? কিছু দেওয়া আর কিছু নেওয়াটার মধ্যে সবার আগে একটা মনের পরিচয় থাকা দরকার থাকে। এখানে কোনো বাজার থাকে না, যে পসরা সাজিয়ে সবে আছি। যে কেউ এলো, যেটা ভালো লাগলো সেটা কিনে নিয়ে চলে গেল। এখানে যে মানুষের মন বলে একটা কথা থাকে। মন থেকে দিতে পারলে তার আনন্দটাই আলাদা। মন থেকে যা দেওয়া যায় সেটাই সব থেকে বড় প্রাপ্তি। এক জায়গায় রয়েছি, একসাথে রয়েছি, তবুও কোথায় যেন একটা ভুলের কারণে সবকিছু ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। কোথায় যেন একটা বন্ধনের সেতুটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। সেটাকে তো ভাবতে পারছি না। কেন বারবার এই ভুলটা হয়ে যাচ্ছে। এই জন্য গানটাকে সংশোধন করে নিতে হবে। তারপর মনে হয় না আর কোনো সমস্যা থাকতে পারে। কী দিতে পারবে, কতখানি দিতে পারবে, তার তো হিসাব নেই। প্রথমেই বলে দিয়েছি, যদি দিতে হয় তবে প্রতিটা মানুষের মধ্যে আন্তরিকতায় ভরিয়ে দাও। প্রতিটি মানুষের মধ্যে ভালোবাসায় ভরিয়ে দাও। মানুষের মধ্যে বিশ্বাসের বীজটাকে রোপন করে দাও। মানুষকে আরও বেশি করে আপন করে নেবার চেষ্টা করো। কাউকে দূরে সরিয়ে দিলে সে কিন্তু পর হয়ে যায় না। হিসাবের খাতাটা খুলে দেখো, সবথেকে তুমিই পর হয়ে যাবে। সেদিন তোমার আপনজন বলে পাশে কেউ থাকবে না। সেদিন বড্ড বেশি একা লাগবে কালকের এই একা লাগাটা যেন বেদনাদায়ক না হয়ে ওঠে। তাই আজ থেকেই আন্তরিকতার, ভালোবাসার ও বিশ্বাসের বীজটাকে রোপন করো। আগামীকাল সেটাই তোমার কাছে ভালোবাসার উপহার হিসাবে ফিরে আসবে। আবার বলি, কী দেবে যার নাম আন্তরিকতা, কতখানি দেবে যার নাম ভালোবাসা। এই দুইয়ের মেলবন্ধনেই যে বিশ্বাস নামক কথাটা সার্থক হয়ে যাবে।

অনিমা চন্দ্র
হাওড়া

উত্তরসম্পাদকীয় লেখা সম্পূর্ণ রূপে লেখকের নিজস্ব অভিমত। এরজন্য 'আর্থিক লিপি' কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।
সম্পাদক

উন্নয়ন ও সমস্যা
চিঠি পাঠান সংক্ষেপে, বিচারাধীন বিষয় এবং ব্যক্তি বা দলের বিরুদ্ধে নয়।

পাঠকের দরবারে

চিঠি পাঠান
লিপি
আরামবাগ, লিংকরোড
(ইউবিআই ব্যাঙ্কের নীচে),
হুগলি-৭১২৬০১
ফোন- ০৩২১১- ২৫৭২২২
Email-lipiarambagh@gmail.com

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়